পুরুষ ঃ গঙ্গাচরণ ঃ

'অশনি-সংকেত' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী। সে নায়ক নয়; তবে উপন্যাসের প্রথম থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত সে আছে। উপন্যাসের প্রথম দিকটা তো তারই আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনী। ভাগ্যান্বেষণের জন্য সে স্ত্রী-পুত্রদের হাত ধরে নিজের পৈতৃক গ্রাম হরিহরপুর ত্যাগ করে, অনেক গ্রাম ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত নতুন গাঁ-এ এসে ঘর বেঁধেছে। তবে তার স্ত্রী অনঙ্গ বলেছে, 'স্বামীর মন উড়ু-উড়ু, কোনো গাঁয়ে এক বছরের বেশি তো টিঁকে থাকতে দেখা গেল না।'

কিন্তু নতুন গাঁ-এ গঙ্গাচরণ একরকম টিঁকেই গেল। কারণ এটা চাষী কাপালী এবং গোয়ালাদের গ্রাম। এখানে কোন ব্রাহ্মণের বাস নেই। অভিজ্ঞতা দিয়ে সে জেনেছে, গ্রামে অন্য ব্রাহ্মণ না থাকলে ব্রাহ্মণ হিসেবে সম্মান পাওয়া যায় বেশি। তার অনুমান মিথ্যে নয়। কেউ কলাটা মুলোটা দেয়, কেউ বা মাছ দেয়, দুধ দেয়। তবে গঙ্গাচরণ শুধু অভিজ্ঞ নয়, সে চতুর প্রত্যুৎপন্নমতি এবং উদ্যমী। গ্রামের সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি বিশ্বাসমশাইকে ধরে একটা পাঠশালা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সে করে নিয়েছে। এতেও তার আয়ের কিছুটা সুরাহা হয়েছে। পাঠশালার ফাঁকিবাজ গুরুমশায় সে নয়। ছেলেদের নিয়ে সে ব্যস্ত থাকে—কাউকে নামতা পড়ায়, কাউকে পড়ায় ইংরেজী ফার্স্ট বুক। আবার পাঠশালার ছুটির পর গ্রামের মণ্ডপঘরে গিয়ে বসে। সেখানে সমবেত গ্রামবাসীদের কাছে নিজের

পরিচয় দিয়ে একটু বিদ্যে জাহির করার চেষ্টা করে, যাতে তারা বিশ্বাস করে তার পাঠশালায় তাদের ছেলেদের পড়তে পাঠায়। এখানে আলোচনাপ্রসঙ্গে কায়দা করে সে পৌরোহিত্য করার ক্ষমতাটাও প্রকাশ করে, সুযোগমত দু'একটা সংস্কৃত শ্লোকও আওড়ায়। তার আচার-আচরণে যেটা বড় হয়ে প্রকাশ পায়, তা হল ভড়ং। এই 'ভড়ং-সর্বস্বতা সর্বাধিক প্রকট হয়ে উঠেছে গোবধজনিত মহাপাপে বিশ্বাসমশাইয়ের ব্যাধিগ্রস্ত নাতিটির জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন এবং কামদেবপুরে গাঁ-বন্ধকে কেন্দ্র করে। দুটি কাজেই গঙ্গাচরণ কর্মকর্তাদের যে দীর্ঘ ফর্দ বাতলেছে তা আধিদৈবিক প্রয়োজন অপেক্ষা তার আত্মোদর পূরণের লোভটিকেই বিশেষভাবে পরিস্ফুট করে। তবে গাঁ-বন্ধ করতে সে যে-সব বিধান দিয়েছে, তা যে তার ছাত্রপাঠ্য 'স্বাস্থ্য-প্রবেশিকা' বই পড়ার ফলে সম্ভব হয়েছে; এতে তার উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গাচরণ কবিরাজিও করে। বিভূতিভূষণ মনে হয়, ধর্মের নামে এই আচার-সর্বস্ব ভড়ং-বাজিকে কিছুটা শ্লেষাত্মক দৃষ্টিতেই দেখেছেন।

কিন্তু ভড়ংদার হলেও স্ত্রী-পুত্রদের প্রতি গঙ্গাচরণের স্নেহ ভালবাসা ছিল। সে তো যে কোন উপায়ে কিছুটা অবস্থা ফিরিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিল। 'আতুরে নিয়মো নাস্তি'—দারিদ্র্য হয়তো কোন নিয়মনীতি মানে না। তাই গঙ্গাচরণের প্রতি তার স্রষ্টাও এখানে কঠোর হতে পারেন নি। নিজে অল্প শিক্ষিত দরিদ্র হলেও পুত্র পটলকে সে মানুষ করতে চায়। 'ব্রাহ্মণের ছেলে, বাঁশ-কঞ্চি নিয়ে থাকে না রাতদিন।' এই উক্তির মধ্যে তার জাত্যাভিমানও কিছুটা আছে।

গঙ্গাচরণ স্বার্থ-সচেতন কিন্তু একেবারে আত্মকেন্দ্রিক নয়। সে তার সমধর্মী শিক্ষক দুর্গাপদ এবং দীনু ভট্চাযকে যেভাবে আতিথ্য ও আশ্রয় দান করেছে তাতে তার সহৃদয়তা এবং সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষের দিনে নিজেদের বহুকষ্টে সংগৃহীত খাদ্য থেকে ভাগ দিয়ে অনঙ্গ এইসব অতিথিদের দেবতাজ্ঞানে সেবা করেছে। গঙ্গাচরণ অসন্তুষ্ট হয়েছে, বিরক্ত হয়েছে কিন্তু দু'একবার মৃদু আপত্তি ছাড়া স্ত্রী বা এদের সঙ্গে কোন রূঢ় ব্যবহার করেনি।

জীবিকার জন্য গঙ্গাচরণ অনেক পথই ধরেছে। কিন্তু তার সব থেকে বড় স্বপ্ন জমির। ছায়া-ভরা বিকেলে মাঠের পথে যেতে যেতে কল্পনাচক্ষে সে ভবিষ্যৎ গৃহস্থালির ছবি আঁকে—যদি কিছু চাষের জমি বন্দোবস্ত করা যায় আর একটা লাঙল—তাহলে 'ভাত-কাপড়ের অভাব দূর হবে সংসারের।'

কিন্তু সংসারে ক'জনেরই বা সুখ-স্বপ্ন সার্থক হয়! বিশেষ করে গঙ্গাচরণের মত হতভাগ্য সাধারণ মানুষদের? তাই গঙ্গাচরণের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। এদিকে ঈশান কোণের আকাশে বজ্রগর্ভ মেঘের সঞ্চার হয়! ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়! চালের দাম দিনে দিনে বাড়তে বাড়তে একেবারে মহার্ঘ্য হয়ে ওঠে—শেষে বাজার থেকে একেবারে উধাও। হাজার হাজার অনশন-ক্লিষ্ট মানুষের সঙ্গে গঙ্গাচরণও পথে বেরিয়ে পড়ে একমুঠো চালের সন্ধানে। সর্বত্র আকাল! আকাল! মহা মন্বন্তর।

অভুক্ত গঙ্গাচরণের এক গৃহস্থের বাড়িতে খাবার আয়োজন হয়। কিন্তু খেতে গিয়ে তার মনে পড়ে ক্ষুধার্ত স্ত্রী এবং সন্তানদের কথা। পুত্র দুটি বড় হয়েছে, তারা হয়তো কিছু সংগ্রহ করতে পারবে। কিন্তু স্ত্রী সদ্য প্রসূতি—রুগ্‌ণ, দুর্বল। তাছাড়া নিজের ক্ষুধার অন্ন সে অপরের মুখে তুলে দেয় অনায়াসে। এমন স্ত্রীর জন্য গঙ্গাচরণের চিন্তার শেষ থাকে

না। বাজারের দোকানে জোড়া সন্দেশ দেখে স্ত্রীকে খাওয়াবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। দেশব্যাপী নিদারুণ খাদ্যাভাবে মানুষের জীবনের সব রূপ, রস, গন্ধ যখন শুকিয়ে যাচ্ছে, তখন যে-হৃদয়ের প্রেম এমন স্বতঃস্ফূর্ত ও সজীব থাকে, সে-হৃদয় মহৎ, সন্দেহ নেই।

দুঃখের দহনে পুড়ে মানুষ মহত্ত্ব অর্জন করে। গঙ্গাচরণও এর ব্যতিক্রম নয়। পারমিট-অফিসে পারমিট-প্রার্থী বৃদ্ধটির প্রতি তাই সে অনুকম্পায় আপ্লুত হয়ে ওঠে। অনশন-ক্লিষ্টা মতি-মুচিনীর প্রতিও তার মমতা আছে। কিন্তু এতদিনের জন্মগত জাত-বিচারের সংস্কারটা তার হৃদয়দ্বারে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে থাকে। তাই মতির শব সে প্রথমে স্পর্শ করতে চায় না। শেষ পর্যন্ত অনঙ্গর অনুপ্রেরণায় তার ভ্রান্তি ঘোচে। অপরের সঙ্গে সেও মতির সৎকারে এগিয়ে আসে।

তবে আমাদের মনে হয়, আলোচ্য উপন্যাসে এটাই গঙ্গাচরণের শ্রেষ্ঠ কাজ নয়। বিভূতিভূষণ এ কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার রেখেছেন অনঙ্গ-র জন্য। তিনি গঙ্গাচরণকে দিয়ে আর একটি শুধু মহৎ কাজ নয়, মহৎ এবং সত্য কথা বলিয়েছেন এ উপন্যাসে—'জমি না চষে পরের খাবে, এ আর চলবে না। চাষা লাঙ্গল ধরে চাষ করে, আমরা তার ওপর বসে খাই, এ ব্যবস্থা ছিল বলেই আজ আমাদের এ দুর্দশা। ...এবার যদি নিজের হাতে লাঙ্গল ধরে চাষ করতে হয় তাও করব—একটু জমি পেলে হয়।' অর্থাৎ ভূমিহীন মানুষকে ভূমির অধিকার দেবার কথা বলেছেন বিভূতিভূষণ। দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হলে চাই গ্রামীন অর্থনীতির উন্নতি এবং তা সম্ভব কৃষির উন্নতির মাধ্যমে। আমাদের মনে হয়, গঙ্গাচরণের মধ্যে দিয়ে লেখকের আত্মপ্রক্ষেপণ ঘটেছে এক্ষেত্রে। কারণ বিভূতিভূষণের এই সময়ের দিনলিপি থেকে জানা যায় তিনি নিজ গ্রাম বারাকপুরে এবং ঘাটশিলায় জমি কেনার জন্য খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন এবং বেশ কিছু ধানী জমি কিনেও ছিলেন।

এদিক থেকে বিচার করলে গঙ্গাচরণ বিভূতি-সাহিত্যে একটি ব্যতিক্রমী এবং স্মরণীয় সৃষ্টি। মন্বন্তরের মহা মিছিলে সে হারিয়ে যায় নি। তার সমস্ত দোষগুণ মিলিয়ে সে স্মরণীয়।